সাহিত্য

- *সাহিত্য* গদ্যগ্রন্থাবলীর চতুর্থ ভাগ রূপে ১৩১৪ বঙ্গাব্দে (১৯০৭ খ্রিস্টাব্দ) প্রথম প্রকাশিত হয়।
- 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় *ভারতী*-র ১৩০৫ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায়। (১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দ)।
- 'সাহিত্যের তাৎপর্য' প্রথম প্রকাশিত হয় *নবপর্যায় বঙ্গদর্শন*-এর ১৩১০ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায়। (১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ।)

ঐতিহাসিক উপন্যাস

- **ইংরেজ ঐতিহাসিকদের মধ্যে ফ্রীম্যান সাহেবের নাম সুবিখ্যাত:** Edward Augustus Freeman (১৮২৩ - ১৮৯২) ছিলেন উনিশ শতকের একজন বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক ও রাজনীতিবিদ। ১৮৬৭ থেকে ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয় ৬ খণ্ডে লেখা তাঁর গবেষণাগ্রন্থ *The History of Norman Conquest of England: Its Causes and Its Results*।
- **য়ুরোপের ধর্মযুদ্ধযাত্রা-যুগ:** সহজ ব্যাখ্যায় ক্রুসেড হলো বিধর্মীদের হাত থেকে জেরুজালেম উদ্ধারের জন্য সংঘটিত একাধিক যুদ্ধ। একাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী জুড়ে ক্রুসেড সংঘটিত হয়। যদিও ঐতিহাসিকেরা ক্রুসেডকে নিছক ধর্মযুদ্ধ বলে মনে করেন না।
- **চিরন্তন মানব-ইতিহাসের নিত্যসত্য:** "যাহা জ্ঞানের কথা তাহা প্রচার হইয়া গেলেই তাহার উদ্দেশ্য সফল হইয়া শেষ হইয়া যায়। মানুষের জ্ঞান সম্বন্ধে নূতন আবিষ্কারের দ্বারা পুরাতন আবিষ্কার আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে। কাল যাহা পণ্ডিতের অগম্য ছিল আজ তাহা অর্বাচীন বালকের কাছেও নূতন নহে। যে সত্য নূতন বেশে বিপ্লব আনয়ন করে সেই সত্য পুরাতন বেশে বিস্ময়মাত্র উদ্রেক করে না। আজ যে-সকল তত্ত্ব মূঢ়ের নিকট পরিচিত কোনো কালে তাহা পণ্ডিতের নিকটেও বিস্তর বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইহাই লোকের কাছে আশ্চর্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু হৃদয়ভাবের কথা প্রচারের দ্বারা পুরাতন হয় না।" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যের সামগ্রী', *সাহিত্য*)
- **ইতিহাসের বিশেষ সত্য এবং সাহিত্যের নিত্যসত্য:** রবীন্দ্রনাথের কাছে সাহিত্য হল মানুষের সুখ-দুঃখের অনুভূতির সত্যতর প্রকাশ। কীভাবে?

  ১. "আমার হৃদয়বেদনায় পৃথিবীর যত বেশি লোক সমবেদনা অনুভব করিবে ততই তাহার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমি যাহা একান্তভাবে অনুভব করিতেছি তাহা যে আমার দুর্বলতা, আমার ব্যাধি, আমার পাগলামি নহে, তাহা যে সত্য, তাহা সর্বসাধারণের হৃদয়ের মধ্যে প্রমাণিত করিয়া আমি বিশেষ সুখ পাই।" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যের বিচারক', *সাহিত্য*)

  ২. "আমার সুখদুঃখ আমার কাছে অব্যবহিত, তোমার কাছে তাহা অব্যবহিত নয়। আমি হইতে তুমি দূরে আছ। সেই দূরত্বটুকু হিসাব করিয়া আমার কথা তোমার কাছে কিছু বড় করিয়াই বলিতে হয়।" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যের বিচারক', *সাহিত্য*)

  ৩. "সত্যরক্ষাপূর্ব্বক এই বড়ো করিয়া তুলিবার ক্ষমতায় সাহিত্যকারের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। যেমনটি ঠিক তেমনটি লিপিবদ্ধ করা সাহিত্য নহে।" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যের বিচারক', *সাহিত্য*)

  ৪. "প্রাকৃত-সত্যে ও সাহিত্য-সত্যে এইখানেই তফাত আরম্ভ হয়। সাহিত্যের মা যেমন করিয়া কাঁদে প্রাকৃত মা তেমন করিয়া কাঁদে না।" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যের বিচারক', *সাহিত্য*)

  ৫. "এইজন্যই সাহিত্য ঠিক প্রকৃতির আরশি নহে। কেবল সাহিত্য কেন, কোনো কলাবিদ্যাই প্রকৃতির যথাযথ অনুকরণ নহে।" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যের বিচারক', *সাহিত্য*)
- **সার ফ্রান্সিস পালগ্রেভ:** স্যার ফ্রান্সিস পালগ্রেভ (১৭৮৮ - ১৮৬১) একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলি হল: *A History of England* (1831), *The Rise and Progress of the English Commonwealth* (1832), *An Essay on the Original Authority of the King's Council* (1834), *Truths and Fictions of the Middle Ages: the Merchant and the Friar* (1837) and *The History of Normandy and England* (1851–64, 4 volumes, of which the last two appeared posthumously).

- **অলঙ্কারশাস্ত্রে রসাত্মক বাক্য:** আলঙ্কারিক অভিনবগুপ্তের মতে: সাহিত্যরস আস্বাদনযোগ্য, কিন্তু তার উপযুক্ত রসনেন্দ্রিয় সহৃদয়ের অন্তরেন্দ্রিয়, তার অনুভূতিপ্রবণ চিত্ত। সাহিত্যিক রস ‘মধুর’, ‘অম্ল’ প্রভৃতি রসের মতো বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, তা অন্তরেন্দ্রিয়বেদ্য। সেটাই সাহিত্যের অন্তরতম তত্ত্ব, ঔপনিষদিক ব্রহ্মের মতো এর স্বরূপ গুহানিহিত- ‘নিহিতং গুহা যৎ’। ভাষার দ্বারা রসকে স্পর্শমাত্র করা যায়, কিন্তু এর আসল স্বরূপ উদঘাটিত হয় কেবল তাঁরই কাছে, যিনি এর অপরোক্ষ মানসানুভূতি লাভ করতে পেরেছেন।
- **আমাদের অলঙ্কারে নয়টি মূলরসের নামোল্লেখ আছে:** ভরতের নাট্যশাস্ত্রে আটটি স্থায়ীভাব ও আটটি রসের উল্লেখ আছে:

	স্থায়িভাব	**রস**
	“রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।	“শৃঙ্গারহাস্যকরুণা রৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।
	জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেতি স্থায়িভাবাঃ প্রকীর্তিতাঃ॥”	বীভৎসাদ্ভূতোসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ॥”
১.	রতি	শৃঙ্গার [erotic]
২.	হাস	হাস্য [comic]
৩.	শোক	করুণ [pathetic]
৪.	ক্রোধ	রৌদ্র [Furious]
৫.	উৎসাহ	বীর [Heroic]
৬.	ভয়	ভয়ানক [terrible]
৭.	জুগুপ্সা	বীভৎস [odious]
৮.	বিস্ময়	অদ্ভূত [marvelous]

পরবর্তীকালে আরো দুটি রসের কথা বলেছিলেন রুদ্রট। একটি ‘প্রেয়’ অন্যটি ‘শান্ত’। যার মধ্যে ‘শান্ত’-ই অধিক প্রচলিত (স্থায়ী ভাব ‘সম’)।

- **অনির্বচনীয় মিশ্ররস:** ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রে মিশ্ররস বলে কিছু হয় না। রবীন্দ্রনাথ-ও তা বলেছেন। তাঁর এই মিশ্ররসের ধারণাটি এ প্রবন্ধে যথাযথভাবে ব্যাখ্যাতও হয়নি।
- **ঐতিহাসিক রস:** ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্র মতে মহাকাব্যের রসপরিণতি চার প্রকারের হতে পারে: শৃঙ্গার, করুণ, বীর ও শান্ত। ঐতিহাসিক রস বলে কিছু হয় না। এও রবীন্দ্রনাথের স্বোদভাবন। বস্তুত ইতিহাস আর সাহিত্যের মধ্যে তফাৎ দেখাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক রসের কথা বলেছেন। ইতিহাসের তথ্য যখন সাহিত্যের কল্পনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি সমান্তরাল বাস্তবজগৎ নির্মাণ করতে সক্ষম হয় তখন তাকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঐতিহাসিক উপন্যাস।

‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’ : রবীন্দ্রনাথের সংজ্ঞা

কাকে বলে ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’?— এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে:

> “a novel that has as its setting a period of history and that attempts to convey the spirit, manners, and social conditions of a past age with realistic detail and fidelity (which is in some cases only apparent fidelity) to historical fact. The work may deal with actual historical personages, as does Robert Graves’s *I, Claudius* (1934), or it may contain a mixture of fictional and historical characters.”

সাধারণভাবে দেখতে গেলে ঐতিহাসিক উপন্যাসের বর্ণিত উপন্যাসের অন্তর্বর্তী সময়টিকে হতে হবে ঔপন্যাসিকের রচনাকালের পূর্ববর্তী। কতটা পূর্ববর্তী তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। অন্তত এর কোনো নিশ্চিত সময় নেই। কিন্তু ইতিহাস তো তথ্যনির্ভর, সে তথ্যের ভিত্তি সত্যে। উপন্যাসের তথ্য ও সত্য দুই লেখকের সৃজনশীল কল্পনাশক্তির দান। ইতিহাস আর উপন্যাস যদি মূলগতভাবেই এতটা আলাদা হয় তবে ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’ বলে কিছু কি আদৌ সম্ভব?

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই প্রবন্ধে ইতিহাস আর উপন্যাসের তফাৎ করেছেন সত্যের প্রকারভেদের মাধ্যমেই। ইতিহাসের সত্য তথ্যভিত্তিক, বিশেষ সত্য। সাহিত্যের সত্য নির্বিশেষ, নিত্য। ইতিহাসের সত্য বিশেষ কেন? রবীন্দ্রনাথের ভাষায়:

> "কেমন করিয়া বুঝিব অদ্য যে ঐতিহাসিক সত্য ধ্রুব বলিয়া জানিব কল্য নূতনাবিষ্কৃত দলিলের জোরে তাহাকে ঐতিহাসিক সিংহাসন হইতে বিচ্যুৎ হইতে হইবে না।"

কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে এরকম কোনো সম্ভাবনাই নেই। কেননা রবীন্দ্রনাথের মতে:

> "মনে করো আজ যদি নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয় যে, সুরাসক্ত অনাচারী যদুবংশ গ্রীকজাতীয় এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বাধীন বনবিহারী বংশীবাদক গ্রীসীয় রাখাল, যদি জানা যায় যে তাঁহার বর্ণ জ্যেষ্ঠ বলদেবের বর্ণের ন্যায় শুভ্র ছিল, যদি স্থির হয় নির্বাসিত অর্জুন এশিয়া-মাইনরের কোনো গ্রীক রাজ্য হইতে য়ুনানী রাজকন্যা সুভদ্রাকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন... তথাপি বেদব্যাসের মহাভারত বিলুপ্ত হইবে না..."

আসলে রবীন্দ্রনাথের মতে ইতিহাসের কথা জ্ঞানের কথা, তা জ্ঞানলাভের জন্যই আবশ্যক, সাহিত্যের কথা হৃদয়ের কথা তা আনন্দলাভের জন্য আবশ্যক। সাহিত্য গ্রন্থের 'সাহিত্যের সামগ্রী' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন:

> "যাহা জ্ঞানের কথা তাহা প্রচার হইয়া গেলেই তাহার উদ্দেশ্য সফল হইয়া শেষ হইয়া যায়। মানুষের জ্ঞান সম্বন্ধে নূতন আবিষ্কারের দ্বারা পুরাতন আবিষ্কার আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে। কাল যাহা পণ্ডিতের অগম্য ছিল আজ তাহা অর্বাচীন বালকের কাছেও নূতন নহে। ...কিন্তু হৃদয়ভাবের কথা প্রচারের দ্বারা পুরাতন হয় না।" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যের সামগ্রী', *সাহিত্য*)

তাই রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের তথ্যকে বলেন বিশেষ সত্য। আর সাহিত্যের সত্যকে বলেন নিত্যসত্য। কেননা সাহিত্যের উদ্দেশ্য লৌকিক সত্যানুসন্ধান নয়, অলৌকিক আনন্দের অনুসন্ধান।

রবীন্দ্রনাথ তাই ঐতিহাসিক উপন্যাসের উপন্যাস-অংশটির দিকেই জোর দেন। ইতিহাস সে উপন্যাসের প্রেক্ষাপট মাত্র। তিনি স্পষ্টই জানান:

> "ইতিহাসের সংশ্রবে উপন্যাসে একটা বিশেষ রস সঞ্চার করে, ইতিহাসের সেই রসটুকুর প্রতি ঔপন্যাসিকের লোভ, তাহার সত্যের প্রতি তাঁহার কোনো খাতির নাই।"

এই যে 'রস' একে তিনি 'ঐতিহাসিক রস' বলে চিহ্নিত করেন। ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্র মতে মহাকাব্যের রসপরিণতি চার প্রকারের হতে পারে: শৃঙ্গার, করুণ, বীর ও শান্ত। ঐতিহাসিক রস বলে কিছু হয় না। এ রবীন্দ্রনাথের স্বোদভাবন। বস্তুত ইতিহাস আর সাহিত্যের মধ্যে তফাৎ দেখাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক রসের কথা বলেছেন। ইতিহাসের তথ্য যখন সাহিত্যের কল্পনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি সমান্তরাল বাস্তবজগৎ নির্মাণ করতে সক্ষম হয় তখন তাকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঐতিহাসিক উপন্যাস।

'সাহিত্যের তাৎপর্য': রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব

বাইরের জগৎ হল বিশ্বলোক। এই বিশ্বলোকের তিনটি উপাদান: নিসর্গলোক, মানবলোক, দেবলোক। এই দেবলোক আলাদা কিছু নয়, মানবলোকেরই একটি অংশমাত্র। বিশ্বলোক সাধারণের অর্থাৎ প্রতিটি মানুষ এই বিশ্ব বা বস্তুজগতের উপাদানগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। রবীন্দ্রনাথ একেই বলেন 'বাহিরের জগৎ'।

এই বিশ্বলোক বা 'বাহিরের জগৎ' আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করে অন্য একটা জগৎ তৈরি করে। একে আমরা বলতে পারি কবিমানসলোক। বিশ্বজগৎ হল বস্তুজগৎ। কবিমানসলোক হল বিশ্বজগতের উপাদান নিয়ে তৈরি। বিশ্বজগতের উপাদানগুলি কবি অনুভব করেন এবং ব্যক্তিগত হৃদয়বৃত্তির জারকরসে তাকে জারিত করে তিনি তৈরি করে তাঁর নিজস্ব মানসলোক। নিজের মনে অন্তর্লীন এক মানসজগৎ। বিশ্বজগৎকে কবিমানসলোকে রূপান্তর দান করবার প্রক্রিয়াটি সম্ভব হয় কবির ব্যক্তিগত অনুভবন ক্রিয়ার মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়: "এই হৃদয়বৃত্তির রসে জারিয়া তুলিয়া আমরা বাহিরের জগৎকে বিশেষরূপে আপনার করিয়া লই।"

কিন্তু সব মানুষের মধ্যেই হৃদয়বৃত্তির এরকম পর্যাপ্ততা থাকে না। যাদের থাকে না তারা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'জড়প্রকৃতি'। এই জড়প্রকৃতি লোক বস্তুজগৎকে হৃদয়বৃত্তির জারকরসে দ্রবীভূত করে নিজস্ব মানসলোক সৃজন করতে পারেন না। যাঁরা একাজ করতে পারেন তাঁরাই ভাবুক বা কবি অথবা যুগপৎ ভাবুক ও কবি দুই-ই।

এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে ধ্বন্যালোকের একটি শ্লোক:

> "অপার কাব্যসংসারে কবিরেকঃ প্রজাপতিঃ।
> যথাস্মৈ রোচতে বিশ্বং তথেদং পরিবর্ততে॥
> শৃঙ্গারী চেৎকবিঃ কাব্যে জাতংরসময়ং জগৎ।
> স এব বীতরাগশ্চেন্নীরসং সর্বমেব তৎ॥
> ভাবানচেতনানপি চেতনবচ্চেতনানচেতনবৎ।
> ব্যবহারয়তি যথেষ্টং সুকবিঃ কাব্যে স্বতন্ত্রতয়া॥"

অর্থাৎ, অপার কাব্যসংসারে কবিই একমাত্র প্রজাপতি (ব্রহ্মা)। তাঁর (কবির) যা অভিরুচি সেইভাবেই এই (কাব্য)বিশ্ব পরিবর্তিত হয়। যদি কবি শৃঙ্গাররসপ্রবণ হন তাহলে সমগ্র (কাব্য)জগৎ রসময় হয়। আবার তিনিই যদি বীতরাগ হন তাহলে সকল জগৎ রসহীন হয়ে পড়ে। কবি অচেতন বস্তুতে প্রাণদান করতে পারেন, আবার চেতন বস্তুকে অচেতন বস্তুর ব্যবহারে প্রবর্ত্তিত করতে পারেন। কাব্যে কবির ব্যবহার স্বাধীন। এখানে তিনি স্বতন্ত্র, সর্জ্জক – বাইরের কোন কিছুর পারতন্ত্র তাঁর নেই।

অগ্নিপুরাণ থেকে গৃহীত এই শ্লোকে কবিকে বলা হয়েছে সর্জ্জক। তিনি প্রকৃতির অনুকারক মাত্র নন। প্লেটোর অনুকরণতত্ত্বকে অস্বীকার করে রবীন্দ্রনাথ বলেন: "...সাহিত্য ঠিক প্রকৃতির আরশি নহে। কেবল সাহিত্য কেন, কোনো কলাবিদ্যাই প্রকৃতির যথাযথ অনুকরণ নহে।" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যের বিচারক', *সাহিত্য*) সাহিত্য বিশ্বজগতের অনুকরণমাত্র নয়। কেননা বিশ্বজগৎ আর কাব্যজগতের মাঝে ঐ কবিমানসলোক আছে। কবিমানসে আছে কবির হৃদয়বৃত্তি। এই হৃদয়বৃত্তির জারকরসে দ্রবীভূত করে নিজস্ব মানসলোক সৃজন করতে সক্ষম হন কবি।

কিন্তু হৃদয়বৃত্তি তো সব মানুষেরই আছে। কবির এ হৃদয়বৃত্তি বিশেষ কেন? এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কবিমানসের তিনটি উপাদানকে চিহ্নিত করেন: (১) বিস্ময় (২) প্রেম ও (৩) কল্পনা। কাকে বলে বিস্ময়? সাহিত্যদর্পণকার (বিশ্বনাথ কবিরাজ) লিখেছেন:

> "বিবিধেষু পদার্থেষু লোকসীমাতিবর্তীষু।
> বিস্ফারশ্চেতনো যস্তু স বিস্ময় উদাহৃত।"

অর্থাৎ, "বিবিধ পদার্থের লোকসীমা অতিক্রম করে চেতনার যে বিস্ফার বা চেতনার যে নির্বাধ প্রকাশ তাকে বলে বিস্ময়।" একটু সহজ করে বললে জগৎ সম্পর্কে যে রহস্যচেতনা তাই হল বিস্ময়। প্রেম হল জগৎ সম্পর্কে অনুরক্তি বা আসক্তি। আর কল্পনা হল: "যে শক্তির দ্বারা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের মিলনটা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের মিলন না হয়ে মনের মিলন হয়ে ওঠে সে শক্তি হচ্ছে কল্পনাশক্তি।" ('সাহিত্যর তাৎপর্য',*সাহিত্য*)

বিস্ময়, প্রেম ও কল্পনা— কবিমানসের এই তিনটি উপাদান বাইরের জগৎকে কবির নিজের জগৎ করে তোলে। এই তিনটি উপাদান আছে বলেই কবিপ্রতিভার অস্তিত্ব আছে। এর সাহায্যেই কবির অনুভবন ক্রিয়াটি সংঘটিত হয়। অবশ্য এ তিনটি উপাদান শুধু যে কবিরই থাকবে এমন নয়, ভাবুকমাত্রেরই তা আছে। ভাবুক আর কবির মধ্যে পার্থক্য হল: ভাবুকও বাইরের জগৎকে অনুভাবন ক্রিয়ার মাধ্যমে নিজের জগৎ করে তোলেন কিন্তু সে জগৎকে ভাষাজগতে বদলে দেবার সামর্থ্য তাঁর নেই; কবির তা আছে। কবিমানসলোকের বিচিত্র উদ্ভাস যখন সামাজিক ভাষায় প্রকাশিত হয় তখন সেই ভাষালোককেই আমরা বলতে পারি কবির শিল্পলোক। শিল্পলোক হল কবিমানসলোকেরই আংশিক প্রকাশ। কবিমানসলোককে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'মানুষের জগৎ'।

এই মানুষের জগৎ ঐতিহ্যসূত্রে আবহমানকাল ধরে প্রবাহিত হয়ে আসছে। এই প্রবাহ একইসঙ্গে পুরাতন এবং নিত্যনূতন। রবীন্দ্রনাথের মতে স্মরণাতীত কাল থেকে ঐতিহ্যসূত্রে প্রবাহিত বলেই এই স্রোত সনাতন, সনাতন বলেই তা পুরাতন হয়েও চিরন্তন। মানুষ তার যে মানবিক সংস্কারগুলি স্মরণাতীত কাল থেকে বহন করে চলেছে এবং তার সেই সংস্কার ও স্বতন্ত্র হৃদয়বৃত্তির অনুভব মিলেমিশে যা সৃজন করছে তাই কবির মানসলোকে ধৃত হচ্ছে।

কিন্তু এই মানসলোক রূপের নয়, অরূপের জগৎ। যেহেতু এর ভাষিক প্রকাশ নেই। তাই আভিধানিকভাবেই সে অনির্বচনীয়। ভাবুক-কবি যদি তাঁর এই মানসলোকের অনুভূতিমালাকে ভাষারূপ না দেন তবে সে অনুভূতি ঐ ভাবুক-কবির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হয়ে যাবে।

কিন্তু মানুষ তো তার অনুভবকে নষ্ট করতে চায় না। সে নিজেকে ব্যক্ত করবার জন্য ব্যাকুল। ভাষাতীত অপরূপের জগৎকে রূপের জগতে রূপান্তরিত করবার অভীপ্সাতেই সে সৃষ্টি করে; সে সিসৃক্ষু।

মানুষ সিসৃক্ষু কিন্তু তার ঐ সিসৃক্ষাকে বাইরে প্রকাশ করবার উপায় কী? উপায় ভাষা। কবির আর পাঠকের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজটা করে এই ভাষাই। তাই কবিমানসের ঐ একান্ত উপলব্ধিকে "অলঙ্কারের, রূপকের, ছন্দের, আভাসের, ইঙ্গিতের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়।" এই প্রক্রিয়া হলো কবির প্রকাশন ক্রিয়া।

কিন্তু কবিমানসলোকের ঐ অনুভূতিমালা যা অনির্বচনীয় তার সবই কি ভাষায় সম্পূর্ণত প্রকাশ করা সম্ভব? 'ভাষার মধ্যে ভাষাতীত'-কে প্রকাশ করবার জন্যই ভাষায় আমদানী করতে হয় (১) চিত্র আর (২) ধ্বনি। চিত্র হলো ভাষায় ছবি আঁকা। সংগীত বলতে এখানে ছন্দসংগীত। চিত্রের সঙ্গে অর্থালঙ্কার আর সংগীতের সঙ্গে ছন্দ ছাড়াও শব্দালঙ্কারের একটা যোগ রয়েছে। এ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের পক্ষপাতিত্ব সংগীতের দিকে। রবীন্দ্রনাথ বলেন: "চিত্র ভাবকে আকার দেয়, সংগীত ভাবকে গতিদান করে।" বস্তুত সংগীত হল তাই যা শ্রাব্য, আর চিত্র হল দেখার বিষয়। দর্শন আর শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের এই দুই উপলব্ধিকে ভাষায় সঞ্চার করে দেওয়া সম্ভব হলে যা ভাষাতীত তাও ভাষালোকে প্রকাশ পেতে পারে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্যের দুটি মৌল উপকরণই হল: চিত্র ও সংগীত।

কিন্তু এ তো গেল শুধু কাব্যের কথা। বিশিষ্টার্থে গীতিকাব্যের কথা যেখানে কবির 'ভাব' বা অনুভবই কাব্যের মূল বিষয়। বিশ্বলোক থেকে কবিমানসলোক হয়ে শিল্পলোকের এই যাত্রা পুরোটাই যে একজন গীতিকবির যাত্রাপথ তা তো নয়, এ হতে পারে কথাসাহিত্যিক বা মহাকাব্যের কবির যাত্রাপথও। সেখানে শুধু ভাবপুঞ্জ সৃষ্টি করলে চলে না, সৃষ্টি করতে হয় চরিত্র-ও। 'চরিত্র' শব্দের একটা ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো 'যে চলে'। 'পরিবর্তনশীল' এই মানবচরিত্রও বিশ্বলোক থেকে গৃহীত হয়ে কবিমানসলোকে পুনর্সৃজিত হয়ে ভাষালোকে প্রকাশিত হয়। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেন সাহিত্যের বিষয় হলো দুটি: (১) মানবহৃদয় ও (২) মানবচরিত্র।

ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন এই বিশ্বলোক। এই বিশ্বলোক তাই এক অর্থে ঈশ্বরের আপন অভিব্যক্তিরই প্রকাশ মাত্র। গীতাঞ্জলি পর্বের রবীন্দ্রনাথ বলবেন, তেমনই কবিও তাঁর আনন্দকে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ করছেন।

ঋণ: তপোব্রত ঘোষ

দ্রষ্টব্য:
১. জগদীশ ভট্টাচার্য, 'কবিমানস', *রবীন্দ্রচিত্তে জনচেতনা*, কলকাতা: ভারবি, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮
২. সত্যেন্দ্রনাথ রায়, *সাহিত্যতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা: দেজ, ২০১৮
৩. *Historical Novel,* https://www.britannica.com/art/historical-novel
৪. https://awriterofhistory.com/2015/03/24/7-elements-of-historical-fiction/

ঐতিহাসিক উপন্যাস

মানবসমাজের সে বাল্যকাল কোথায় গেল যখন প্রকৃত এবং অপ্রকৃত, ঘটনা এবং কল্পনা, কয়টি ভাইবোনের মতো একান্নে এবং একত্রে খেলা করিতে করিতে মানুষ হইয়াছিল? আজ তাহাদের মধ্যে যে এতবড়ো একটা গৃহবিচ্ছেদ ঘটিবে তাহা কখনো কেহ স্বপ্নেও জানিত না।

এক সময়ে রামায়ণ-মহাভারত ছিল ইতিহাস। এখনকার ইতিহাস তাহার সহিত কুটুম্বিতা স্বীকার করিতে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়; বলে, কাব্যের সহিত পরিণীত হইয়া উহার কুল নষ্ট হইয়াছে। এখন তাহার কুল উদ্ধার করা এতই কঠিন হইয়াছে যে, ইতিহাস তাহাকে কাব্য বলিয়াই পরিচয় দিতে ইচ্ছা করে। কাব্য বলে, ভাই ইতিহাস, তোমার মধ্যে অনেক মিথ্যা আছে, আমার মধ্যেও অনেক সত্য আছে; এসো আমরা পূর্বের মতো আপস করিয়া থাকি। ইতিহাস বলে, না ভাই, পরস্পরের অংশ বাঁটোয়ারা করিয়া বুঝিয়া লওয়া ভালো। জ্ঞান-নামক আমিন সর্বত্রই সেই বাঁটোয়ারাকার্য আরম্ভ করিয়াছে। সত্যরাজ্য এবং কল্পনারাজ্যের মধ্যে একটা পরিষ্কার রেখা টানিবার জন্য সে বদ্ধপরিকর।

ইতিহাসের ব্যতিক্রম করা অপরাধে ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিরুদ্ধে যে নালিশ উত্থাপিত হইয়াছে তাহাতে বর্তমানকালে সাহিত্যপরিবারের এই গৃহবিচ্ছেদ প্রমাণ হয়।

এ নালিশ কেবল আমাদের দেশে নয়, কেবল নবীনবাবু এবং বঙ্কিমবাবু অপরাধী নহেন, ঐতিহাসিক উপন্যাস-লেখকদের আদি এবং আদর্শ স্কটও নিষ্কৃতি পান নাই।

আধুনিক ইংরাজ ঐতিহাসিকদের মধ্যে ফ্রীম্যান সাহেবের নাম সুবিখ্যাত। উপন্যাসে ইতিহাসের যে বিকার ঘটে সেটার উপরে তিনি আক্রোশ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, যাঁহারা য়ুরোপের ধর্মযুদ্ধযাত্রা-যুগ (The Age of the Crusades) সম্বন্ধে কিছু জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা যেন স্কটের আইভ্যান্‌হো পড়িতে বিরত থাকেন।

অবশ্য, য়ুরোপের ধর্মযুদ্ধযাত্রা-যুগ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানা আবশ্যক সন্দেহ নাই, কিন্তু স্কটের আইভ্যান্‌হোর মধ্যে চিরন্তন মানব-ইতিহাসের যে নিত্যসত্য আছে তাহাও আমাদের জানা আবশ্যক। এমন-কি, তাহা জানিবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের এত বেশি যে, ক্রুজেড-যুগ সম্বন্ধে ভুল সংবাদ পাইবার আশঙ্কাসত্ত্বেও ছাত্রগণ অধ্যাপক ফ্রীম্যানকে লুকাইয়া আইভ্যান্‌হো পাঠ করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিবে না।

এখন আলোচ্য এই যে, ইতিহাসের বিশেষ সত্য এবং সাহিত্যের নিত্য সত্য উভয় বাঁচাইয়াই কি স্কট আইভ্যান্‌হো লিখিতে পারিতেন না?

পারিতেন কি না সে কথা আমাদের পক্ষে নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। দেখিতেছি তিনি সে কাজ করেন নাই।

এমন হইতে পারে, তিনি যে ইচ্ছা করিয়া করেন নাই তাহা নহে। অধ্যাপক ফ্রীম্যান ক্রুজেড-যুগ সম্বন্ধে যতটা জানিতেন স্কট ততটা জানিতেন না। স্কটের সময় প্রমাণ-বিশ্লেষণ এবং ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধান এতদূর অগ্রসর হয় নাই।

প্রতিবাদী বলিবেন, যখন লিখিতে বসিয়াছেন তখন ভালো করিয়া জানিয়া লেখাই উচিত ছিল।

কিন্তু এ জানার শেষ হইবে কবে? কবে নিশ্চয় জানিব ক্রুজেড সম্বন্ধে সমস্ত প্রমাণ নিঃশেষ হইয়া গেছে? কেমন করিয়া বুঝিব অদ্য যে ঐতিহাসিক সত্য ধ্রুব বলিয়া জানিব কল্য নূতনাবিষ্কৃত দলিলের জোরে তাহাকে ঐতিহাসিক সিংহাসন হইতে বিচ্যুত হইতে হইবে না? অদ্যকার প্রচলিত ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়া যিনি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিবেন কল্যকার নূতন ইতিহাসবেত্তা তাঁহাকে নিন্দা করিলে কী বলিব?

প্রতিবাদী বলিবেন, সেইজন্যই বলি, উপন্যাস যত ইচ্ছা লেখো, কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিয়ো না। এমন কথা আজিও এ দেশে কেহ তোলেন নাই বটে, কিন্তু ইংরাজি সাহিত্যে এ আভাস সম্প্রতি পাওয়া গেছে। সার ফ্রান্সিস প্যাল্‌গ্রেভ বলেন, ঐতিহাসিক উপন্যাস যেমন এক দিকে ইতিহাসের শত্রু তেমনি অন্য দিকে গল্পেরও মস্ত রিপু। অর্থাৎ উপন্যাসলেখক গল্পের খাতিরে ইতিহাসকে আঘাত করেন, আবার সেই আহত ইতিহাস তাঁহার গল্পকেই নষ্ট করিয়া দেয়; ইহাতে গল্প-বেচারার শ্বশুরকুল পিতৃকুল দুই কুলই মাটি।

এমন বিপদ সত্ত্বেও কেন ঐতিহাসিক কাব্য-উপন্যাস সাহিত্যে স্থান পায়? আমরা তাহার যে কারণ মনে জানি সেটা ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করি।

আমাদের অলংকারশাস্ত্রে রসাত্মক বাক্য বলিয়া কাব্যের যে সংজ্ঞা নির্দেশ করা হইয়াছে তাহা অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক সংজ্ঞা আর কোথাও দেখি নাই। অবশ্য, রস কাহাকে বলে সে আর বুঝাইবার জো নাই। যে-কোনো ব্যক্তির আস্বাদনশক্তি আছে রস শব্দের ব্যাখ্যা তাহার নিকট অনাবশ্যক; যাহার ঐ শক্তি নাই তাহার এ-সমস্ত কথা জানিবার কোনো প্রয়োজনই নাই।

আমাদের অলংকারে নয়টি মূলরসের নামোল্লেখ আছে। কিন্তু অনেকগুলি অনির্বচনীয় মিশ্ররস আছে, অলংকারশাস্ত্রে তাহার নামকরণের চেষ্টা হয় নাই।

সেই-সমস্ত অনির্দিষ্ট রসের মধ্যে একটিকে ঐতিহাসিক রস নাম দেওয়া যাইতে পারে। এই রস মহাকাব্যের প্রাণস্বরূপ।

ব্যক্তিবিশেষের সুখদুঃখ তাহার নিজের পক্ষে কম নহে, জগতের বড়ো বড়ো ঘটনা তাহার নিকট ছায়ায় পড়িয়া যায়, এইরূপ ব্যক্তিবিশেষের অথবা গুটিকতক জীবনের উত্থানপতন-ঘাতপ্রতিঘাত উপন্যাসে তেমন করিয়া বর্ণিত হইলে রসের তীব্রতা বাড়িয়া উঠে; এই রসাবেশ আমাদিগকে অত্যন্ত নিকটে আসিয়া আক্রমণ করে। আমাদের অধিকাংশেরই সুখদুঃখের পরিধি সীমাবদ্ধ; আমাদের জীবনের তরঙ্গক্ষোভ কয়েকজন আত্মীয়বন্ধুবান্ধবের মধ্যেই অবসান হয়। বিষবৃক্ষে নগেন্দ্র- সূর্যমুখী-কুন্দনন্দিনীর বিপদ্‌সম্পদ্‌-হর্ষবিষাদ আমরা আপনার করিয়া বুঝিতে পারি; কারণ, সে-সমস্ত সুখদুঃখের কেন্দ্রস্থল নগেন্দ্রের পরিবারমণ্ডলী। নগেন্দ্রকে আমাদের নিকট প্রতিবেশী বলিয়া মনে করিতে কিছুই বাধে না।

কিন্তু পৃথিবীতে অল্পসংখ্যক লোকের অভ্যুদয় হয় যাঁহাদের সুখদুঃখ জগতের বৃহৎব্যাপারের সহিত বদ্ধ। রাজ্যের উত্থানপতন, মহাকালের সুদূর কার্যপরম্পরা যে সমুদ্রগর্জনের সহিত উঠিতেছে পড়িতেছে, সেই মহান্‌ কলসংগীতের সুরে তাঁহাদের ব্যক্তিগত বিরাগ-অনুরাগ বাজিয়া উঠিতে থাকে। তাঁহাদের কাহিনী যখন গীত হইতে থাকে তখন রুদ্রবীণার একটা তারে মূলরাগিণী বাজে এবং বাদকের অবশিষ্ট চার আঙুল পশ্চাতের সরু মোটা সমস্ত তারগুলিতে অবিশ্রাম একটা বিচিত্র গম্ভীর, একটা সুদূরবিস্তৃত ঝংকার জাগ্রত করিয়া রাখে।

এই-যে মানুষের সঙ্গে সঙ্গে কালের গতি ইহা আমাদের প্রতিদিনের প্রত্যক্ষগোচর নহে। যদি বা তেমন কোনো জাতীয় ইতিহাসস্রষ্টা মহাপুরুষ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত থাকেন তথাপি কোনো খণ্ড ক্ষুদ্র বর্তমান কালে তিনি এবং সেই বৃহৎ ইতিহাস একসঙ্গে আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না। অতএব সুযোগ হইলেও এমন-সকল ব্যক্তিকে আমরা কখনো ঠিকমত তাঁহাদের যথার্থ প্রতিষ্ঠাভূমিতে উপযুক্তভাবে দেখিতে পাই না। তাঁহাদিগকে কেবল ব্যক্তিবিশেষ বলিয়া নহে, পরন্তু মহাকালের অঙ্গস্বরূপ দেখিতে হইলে, দূরে দাঁড়াইতে হয়, অতীতের মধ্যে তাঁহাদিগকে স্থাপন করিতে হয়, তাঁহারা যে সুবৃহৎ রঙ্গভূমিতে নায়কস্বরূপ ছিলেন সেটা-সুদ্ধ তাঁহাদিগকে এক করিয়া দেখিতে হয়।

এই-যে আমাদের প্রতিদিনের সাধারণ সুখদুঃখ হইতে দূরত্ব, আমরা যখন চাকরি করিয়া কাঁদিয়া-কাটিয়া খাইয়া-দাইয়া কাল কাটাইতেছি তখন যে জগতের রাজপথ দিয়া বড়ো বড়ো সারথিরা কালরথ চালনা করিয়া লইয়া চলিতেছেন, ইহাই অকস্মাৎ ক্ষণকালের জন্য উপলব্ধি করিয়া ক্ষুদ্র পরিধি হইতে মুক্তিলাভ– ইহাই ইতিহাসের প্রকৃত রসস্বাদ।

এরূপ ব্যাপার আগাগোড়া কল্পনা হইতে সৃজন করা যায় না যে তাহা নহে। কিন্তু যাহা স্বাভাবতই আমাদের হইতে দূরস্থ, যাহা আমাদের অভিজ্ঞতার বহির্বর্তী, তাহাকে কোনো-একটা ছুতায় খানিকটা প্রকৃত ঘটনার সহিত বাঁধিয়া দিতে পারিলে পাঠকের প্রত্যয়-উৎপাদন লেখকের পক্ষে সহজ হয়। রসের সৃজনটাই উদ্দেশ্য, অতএব সেজন্য ঐতিহাসিক উপকরণ যে পরিমাণে যতটুকু সাহায্য করে সে পরিমাণে ততটুকু লইতে কবি কুণ্ঠিত হন না।

শেক্‌সপীয়রের ‘‘অ্যান্টনি এবং ক্লিয়োপাট্রা’ নাটকের যে মূলব্যাপারটি তাহা সংসারের প্রাত্যহিক পরীক্ষিত ও পরিচিত সত্য। অনেক অখ্যাত অজ্ঞাত সুযোগ্য লোক কুহকিনী-নারীমায়ার জালে আপন ইহকাল-পরকাল বিসর্জন করিয়াছে। এইরূপ ছোটোখাটো মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্বের শোচনীয় ভগ্নাবশেষে সংসারের পথ পরিকীর্ণ।

আমাদের সুপ্রত্যক্ষ নরনারীর বিষামৃতময় প্রণয়লীলাকে কবি একটি সুবিশাল ঐতিহাসিক রঙ্গভূমির মধ্যে স্থাপিত করিয়া তাহাকে বিরাট করিয়া তুলিয়াছেন। হৃদ্‌বিপ্লবের পশ্চাতে রাষ্ট্রবিপ্লবের মেঘাড়ম্বর, প্রেমদ্বন্দ্বের সঙ্গে একবন্ধনের দ্বারা বদ্ধ রোমের প্রচণ্ড আত্মবিচ্ছেদের সমরায়োজন। ক্লিয়োপাট্রার বিলাসকক্ষে বীণা বাজিতেছে, দূরে সমুদ্রতীর হইতে ভৈরবের সংহারশৃঙ্গধ্বনি তাহার সঙ্গে এক সুরে মন্দ্রিত হইয়া উঠিতেছে। আদি এবং করুণ রসের সহিত কবি ঐতিহাসিক রস মিশ্রিত করিতেই তাহা এমন-একটি চিত্তবিস্ফারক দূরত্ব ও বৃহত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

ইতিহাসবেত্তা মমসেন পণ্ডিত যদি শেক্‌স্‌পীয়রের এই নাটকের উপরে প্রমাণের তীক্ষ্ণ আলোক নিক্ষেপ করেন তবে সম্ভবত ইহাতে অনেক কালবিরোধ-দোষ (anachronism),অনেক ঐতিহাসিক ভ্রম বাহির হইতে পারে। কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়র পাঠকের মনে যে মোহ উৎপাদন করিয়াছেন, ভ্রান্ত বিকৃত ইতিহাসের দ্বারাও যে-একটি ঐতিহাসিক রসের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা ইতিহাসের নূতন তথ্য-আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হইবে না।

সেইজন্য আমরা ইতিপূর্বে কোনো-একটি সমালোচনায় লিখিয়াছিলাম, ‘‘ইতিহাসের সংস্রবে উপন্যাসে একটা বিশেষ রস সঞ্চার করে, ইতিহাসের সেই রসটুকুর প্রতি ঔপন্যাসিকের লোভ, তাহার সত্যের প্রতি তাঁহার কোনো খাতির নাই। কেহ যদি উপন্যাসে কেবল ইতিহাসের সেই বিশেষ গন্ধটুকু এবং স্বাদটুকুতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহা হইতে অখণ্ড ইতিহাস-উদ্ধারে প্রবৃত্ত হন তবে তিনি ব্যঞ্জনের মধ্যে আস্ত জিরে-ধনে-হলুদ-সর্ষে সন্ধান করেন; মসলা আস্ত রাখিয়া যিনি ব্যঞ্জনে স্বাদ দিতে পারেন তিনি দিন, যিনি বাঁটিয়া ঘাঁটিয়া একাকার করিয়া থাকেন তাঁহার সঙ্গেও আমার কোনো বিবাদ নাই; কারণ, স্বাদই এ স্থলে লক্ষ্য, মসলা উপলক্ষমাত্র।’

অর্থাৎ লেখক ইতিহাসকে অখণ্ড রাখিয়াই চলুন আর খণ্ড করিয়াই রাখুন, সেই ঐতিহাসিক রসের অবতারণায় সফল হইলেই হইল।

তাই বলিয়া কি রামচন্দ্রকে পামর এবং রাবণকে সাধুরূপে চিত্রিত করিলে অপরাধ নাই? অপরাধ আছে। কিন্তু তাহা ইতিহাসের বিরুদ্ধে অপরাধ নহে, কাব্যেরই বিরুদ্ধে অপরাধ। সর্বজনবিদিত সত্যকে একেবারে উল্টা করিয়া দাঁড় করাইলে রসভঙ্গ হয়, হঠাৎ পাঠকদের যেন একেবারে মাথায় বাড়ি পড়ে। সেই একটা দমকাতেই কাব্য একেবারে কাত হইয়া ডুবিয়া যায়।

এমন-কি, যদি কোনো ঐতিহাসিক মিথ্যাও সর্বসাধারণের বিশ্বাস আকর্ষণ করিয়া বরাবর চলিয়া আসে, ইতিহাস এবং সত্যের পক্ষ লইয়া কাব্য তাহার বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিলে দোষের হইতে পারে। মনে করো আজ যদি নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয় যে, সুরাসক্ত অনাচারী যদুবংশ গ্রীকজাতীয় এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বাধীন বনবিহারী বংশীবাদক গ্রীসীয় রাখাল, যদি জানা যায় যে তাঁহার বর্ণ জ্যেষ্ঠ বলদেবের বর্ণের ন্যায় শুভ্র ছিল, যদি স্থির হয় নির্বাসিত অর্জুন এশিয়া-মাইনরের কোনো গ্রীক রাজ্য হইতে য়ুনানী রাজকন্যা সুভদ্রাকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন এবং দ্বারকা সমুদ্রতীরবর্তী কোনো গ্রীক উপদ্বীপ, যদি প্রমাণ হয় নির্বাসনকালে পাণ্ডবগণ বিশেষ রণবিজ্ঞানবেত্তা প্রতিভাশালী গ্রীসীয় বীর কৃষ্ণের সহায়তা লাভ করিয়া স্বরাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাঁহার অপূর্ব বিজাতীয় রাজনীতি যুদ্ধনৈপুণ্য এবং কর্মপ্রধান ধর্মতত্ত্ব বিস্মিত ভারতবর্ষে তাঁহাকে অবতাররূপে দাঁড় করাইয়াছে– তথাপি বেদব্যাসের মহাভারত বিলুপ্ত হইবে না, এবং কোনো নবীন কবি সাহসপূর্বক কালাকে গোরা করিতে পারিবেন না।

আমাদের এইগুলি সাধারণ কথা। নবীনবাবু ও বঙ্কিমবাবু তাঁহাদের কাব্যে এবং উপন্যাসে প্রচলিত ইতিহাসের বিরুদ্ধে এতদূর গিয়াছেন কি না যাহাতে কাব্যরস নষ্ট হইয়াছে তাহা তাঁহাদের গ্রন্থের বিশেষ সমালোচনা-স্থলে বলা যাইতে পারে।

এক্ষণে কর্তব্য কী? ইতিহাস পড়িব না আইভ্যান্‌হো পড়িব? ইহার উত্তর অতি সহজ। দুইই পড়ো। সত্যের জন্য ইতিহাস পড়ো, আনন্দের জন্য আইভ্যান্‌হো পড়ো। পাছে ভুল শিখি এই সতর্কতায় কাব্যরস হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিলে স্বভাবটা শুকাইয়া শীর্ণ হইয়া যায়।

কাব্যে যদি ভুল শিখি ইতিহাসে তাহা সংশোধন করিয়া লইব। কিন্তু যে ব্যক্তি ইতিহাস পড়িবার সুযোগ পাইবে না, কাব্যই পড়িবে সে হতভাগ্য। কিন্তু যে ব্যক্তি কাব্য পড়িবার অবসর পাইবে না, ইতিহাস পড়িবে, সম্ভবত তাহার ভাগ্য আরো মন্দ।

আশ্বিন, ১৩০৫

সাহিত্যের তাৎপর্য

বাহিরের জগৎ আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আর একটা জগৎ হইয়া উঠিতেছে। তাহাতে যে কেবল বাহিরের জগতের রঙ আকৃতি ধ্বনি প্রভৃতি আছে তাহা নহে; তাহার সঙ্গে আমাদের ভালো-লাগা মন্দ-লাগা, আমদের ভয়-বিস্ময়, আমাদের সুখ-দুঃখ জড়িত– তাহা আমাদের হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র রসে নানা ভাবে আভাসিত হইয়া উঠিতেছে।

এই হৃদয়বৃত্তির রসে জারিয়া তুলিয়া আমরা বাহিরের জগৎকে বিশেষরূপে আপনার করিয়া লই।

যেমন জঠরে জারকরস অনেকের পর্যাপ্তপরিমাণে না থাকাতে বাহিরের খাদ্যকে তাহারা ভালো করিয়া আপনার শরীরের জিনিস করিয়া লইতে পারে না তেমনি হৃদয়বৃত্তির জারকরস যাহারা পর্যাপ্তরূপে জগতে প্রয়োগ করিতে পারে না তাহারা বাহিরের জগৎটাকে অন্তরের জগৎ, আপনার জগৎ, মানুষের জগৎ করিয়া লইতে পারে না।

এক-একটি জড়প্রকৃতি লোক আছে জগতের খুব অল্প বিষয়েই যাহাদের হৃদয়ের ঔৎসুক্য, তাহারা জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াও অধিকাংশ জগৎ হইতে বঞ্চিত। তাহাদের হৃদয়ের গবাক্ষগুলি সংখ্যায় অল্প এবং বিস্তৃতিতে সংকীর্ণ বলিয়া বিশ্বের মাঝখানে তাহারা প্রবাসী হইয়া আছে।

এমন সৌভাগ্যবান লোকও আছেন যাঁহাদের বিস্ময় প্রেম এবং কল্পনা সর্বত্র সজাগ, প্রকৃতির কক্ষে কক্ষে তাঁহাদের নিমন্ত্রণ; লোকালয়ের নানা আন্দোলন তাঁহাদের চিত্তবীণাকে নানা রাগিণীতে স্পন্দিত করিয়া রাখে।

বাহিরের বিশ্ব ইঁহাদের মনের মধ্যে হৃদয়বৃত্তির নানা রসে, নানা রঙে, নানা ছাঁচে নানা রকম করিয়া তৈরি হইয়া উঠিতেছে।

ভাবুকের মনে এই জগৎটি বাহিরের জগতের চেয়ে মানুষের বেশি আপনার। তাহা হৃদয়ের সাহায্যে মানুষের হৃদয়ের পক্ষে বেশি সুগম হইয়া উঠে। তাহা আমাদের চিত্তের প্রভাবে যে বিশেষত্ব লাভ করে তাহাই মানুষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপাদেয়।

অতএব দেখা যাইতেছে, বাহিরের জগতের সঙ্গে মানবের জগতের প্রভেদ আছে। কোন্‌টা সাদা, কোন্‌টা কালো, কোন্‌টা বড়ো, কোন্‌টা ছোটো, মানবের জগৎ সেই খবরটুকুমাত্র দেয় না। কোন্‌টা প্রিয়, কোন্‌টা অপ্রিয়, কোন্‌টা সুন্দর, কোন্‌টা অসুন্দর, কোন্‌টা ভালো, কোন্‌টা মন্দ, মানুষের জগৎ সেই কথাটা নানা সুরে বলে।

এই যে মানুষের জগৎ ইহা আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে বহিয়া আসিতেছে। এই প্রবাহ পুরাতন এবং নিত্যনূতন। নব নব ইন্দ্রিয় নব নব হৃদয়ের ভিতর দিয়া এই সনাতন স্রোত চিরদিনই নবীভূত হইয়া চলিয়াছে।

কিন্তু ইহাকে পাওয়া যায় কেমন করিয়া? ইহাকে ধরিয়া রাখা যায় কী উপায়ে? এই অপরূপ মানস-জগৎকে রূপ দিয়া পুনর্বার বাহিরে প্রকাশ করিতে না পারিলে ইহা চিরদিনই সৃষ্ট এবং চিরদিনই নষ্ট হইতে থাকে।

কিন্তু এ জিনিস নষ্ট হইতে চায় না। হৃদয়ের জগৎ আপনাকে ব্যক্ত করিবার জন্য ব্যাকুল। তাই চিরকালই মানুষের মধ্যে সাহিত্যের আবেগ।

সাহিত্যের বিচার করিবার সময় দুইটা জিনিস দেখিতে হয়। প্রথম, বিশ্বের উপর সাহিত্যকারের হৃদয়ের অধিকার কতখানি, দ্বিতীয়, তাহা স্থায়ী আকারে ব্যক্ত হইয়াছে কতটা।

সকল সময় এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না। যেখানে থাকে সেখানেই সোনায় সোহাগা।

কবির কল্পনাসচেতন হৃদয় যতই বিশ্বব্যাপী হয় ততই তাঁহার রচনার গভীরতায় আমাদের পরিতৃপ্তি বাড়ে। ততই মানববিশ্বের সীমা বিস্তারিত হইয়া আমাদের চিরন্তন বিহারক্ষেত্র বিপুলতা লাভ করে।

কিন্তু রচনাশক্তির নৈপুণ্যও সাহিত্যে মহামূল্য। কারণ, যাহাকে অবলম্বন করিয়া সে শক্তি প্রকাশিত হয় তাহা অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ হইলেও এই শক্তিটি একেবারে নষ্ট হয় না। ইহা ভাষার মধ্যে সাহিত্যের মধ্যে সঞ্চিত হইতে থাকে। ইহাতে মানবের প্রকাশক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া দেয়। এই ক্ষমতাটি লাভের জন্য মানুষ চিরদিন ব্যাকুল। যে কৃতিগণের সাহায্যে মানুষের এই ক্ষমতা পরিপুষ্ট হইতে থাকে মানুষ তাঁহাদিগকে যশস্বী করিয়া ঋণশোধের চেষ্টা করে।

যে মানসজগৎ হৃদয়ভাবের উপকরণে অন্তরের মধ্যে সৃষ্ট হইয়া উঠিতেছে তাহাকে বাহিরে প্রকাশ করিবার উপায় কী?

তাহাকে এমন করিয়া প্রকাশ করিতে হইবে যাহাতে হৃদয়ের ভাব উদ্রিক্ত হয়।

হৃদয়ের ভাব উদ্রেক করিতে সাজ সরঞ্জাম অনেক লাগে।

পুরুষ-মানুষের আপিসের কাপড় সাদাসিধা; তাহা যতই বাহুল্যবর্জিত হয় ততই কাজের উপযোগী হয়। মেয়েদের বেশভূষা, লজ্জাশরম ভাবভঙ্গি সমস্ত সভ্যসমাজেই প্রচলিত।

মেয়েদের কাজ হৃদয়ের কাজ। তাহাদিগকে হৃদয় দিতে হয় ও হৃদয় আকর্ষণ করিতে হয়; এইজন্য তাহাদিগকে নিতান্ত সোজাসুজি, সাদাসিধা ছাঁটাছোঁটা হইলে চলে না। পুরুষদের যথাযথ হওয়া আবশ্যক, কিন্তু মেয়েদের সুন্দর হওয়া চাই। পুরুষের ব্যবহার মোটের উপর সুস্পষ্ট হইলেই ভালো, কিন্তু মেয়েদের ব্যবহারে অনেক আবরণ আভাস-ইঙ্গিত থাকা চাই।

সাহিত্যও আপন চেষ্টাকে সফল করিবার জন্য অলংকারের, রূপকের, ছন্দের, আভাসের, ইঙ্গিতের আশ্রয় গ্রহণ করে। দর্শন-বিজ্ঞানের মতো নিরলংকার হইলে তাহার চলে না।

অপরূপকে রূপের দ্বারা ব্যক্ত করিতে গেলে বচনের মধ্যে অনির্বচনীয়তাকে রক্ষা করিতে হয়। নারীর যেমন শ্রী এবং হ্রী সাহিত্যের অনির্বচনীয়তাটিও সেইরূপ। তাহা অনুকরণের অতীত। তাহা অলংকারকে অতিক্রম করিয়া উঠে, তাহা অলংকারের দ্বারা আচ্ছন্ন হয় না। ভাষার মধ্যে এই ভাষাতীতকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সাহিত্য প্রধানত ভাষার মধ্যে দুইটি জিনিস মিশাইয়া থাকে, চিত্র এবং সংগীত।

কথার দ্বারা যাহা বলা চলে না ছবির দ্বারা তাহা বলিতে হয়। সাহিত্যে এই ছবি আঁকার সীমা নাই। উপমা-তুলনা-রূপকের দ্বারা ভাবগুলি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে চায়। "দেখিবারে আঁখি-পাখি ধায়' এই এক কথায় বলরামদাস কী না বলিয়াছেন? ব্যাকুল দৃষ্টির ব্যাকুলতা কেবলমাত্র বর্ণনায় কেমন করিয়া ব্যক্ত হইবে? দৃষ্টি পাখির মতো উড়িয়া ছুটিয়াছে, এই ছবিটুকুতে প্রকাশ করিবার বহুতর ব্যাকুলতা মুহূর্তে শান্তিলাভ করিয়াছে।

এ ছাড়া ছন্দে শব্দে বাক্যবিন্যাসে সাহিত্যকে সংগীতের আশ্রয় তো গ্রহণ করিতেই হয়। যাহা কোনোমতে বলিবার জো নাই এই সংগীত দিয়াই তাহা বলা চলে। অর্থ বিশ্লেষ করিয়া দেখিলে যে কথাটা যৎসামান্য এই সংগীতের দ্বারাই তাহা অসামান্য হইয়া উঠে। কথার মধ্যে বেদনা এই সংগীতই সঞ্চার করিয়া দেয়।

অতএব চিত্র এবং সংগীতই সাহিত্যের প্রধান উপকরণ। চিত্র ভাবকে আকার দেয় এবং সংগীত ভাবকে গতিদান করে। চিত্র দেহ এবং সংগীত প্রাণ।

কিন্তু কেবল মানুষের হৃদয়ই যে সাহিত্যে ধরিয়া রাখিবার জিনিস তাহা নহে। মানুষের চরিত্রও এমন একটি সৃষ্টি যাহা জড়সৃষ্টির ন্যায় আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আয়ত্তগম্য নহে। তাহাকে দাঁড়াইতে বলিলে দাঁড়ায় না। তাহা মানুষের পক্ষে পরম ঔৎসুক্যজনক, কিন্তু তাহাকে পশুশালার পশুর মতো বাঁধিয়া খাঁচার মধ্যে পুরিয়া ঠাহর করিয়া দেখিবার সহজ উপায় নাই।

এই ধরাবাঁধার অতীত বিচিত্র মানবচরিত্র, সাহিত্য ইহাকেও অন্তরলোক হইতে বাহিরে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। অত্যন্ত দুরূহ কাজ। কারণ, মানবচরিত্র স্থির নহে সুসংগত নহে, তাহার অনেক অংশ,অনেক স্তর; তাহার সদর-অন্দরে অবারিত গতিবিধি সহজ নয়। তা ছাড়া তাহার লীলা এত সূক্ষ্ম, এত অভাবনীয়, এত আকস্মিক যে, তাহাকে পূর্ণ আকারে আমাদের হৃদয়গম্য করা অসাধারণ ক্ষমতার কাজ। ব্যাস-বাল্মীকি-কালিদাসগণ এই কাজ করিয়া আসিয়াছেন।

এইবার আমাদের সমস্ত আলোচ্য বিষয়কে এক কথায় বলিতে গেলে এই বলিতে হয় সাহিত্যের বিষয় মানবহৃদয় এবং মানবচরিত্র।

কিন্তু, মানবচরিত্র এটুকুও যেন বাহুল্য বলা হইল। বস্তুত বহিঃপ্রকৃতি এবং মানবচরিত্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অনুক্ষণ যে আকার ধারণ করিতেছে, যে সংগীত ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে, ভাষারচিত সেই চিত্র এবং সেই গানই সাহিত্য।

ভগবানের আনন্দ প্রকৃতির মধ্যে মানবচরিত্রের মধ্যে আপনাকে আপনি সৃষ্টি করিতেছে। মানুষের হৃদয়ও সাহিত্যে আপনাকে সৃজন করিবার, ব্যক্ত করিবার, চেষ্টা করিতেছে। এই চেষ্টার অন্ত নাই, ইহা বিচিত্র। কবিগণ মানবহৃদয়ের এই চিরন্তন চেষ্টার উপলক্ষমাত্র।

ভগবানের আনন্দসৃষ্টি আপনার মধ্য হইতে আপনি উৎসারিত; মানবহৃদয়ের আনন্দসৃষ্টি তাহারই প্রতিধ্বনি। এই জগৎসৃষ্টির আনন্দগীতের ঝংকার আমাদের হৃদয়বীণাতন্ত্রীকে অহরহ স্পন্দিত করিতেছে; সেই-যে মানসসংগীত, ভগবানের সৃষ্টির প্রতিঘাতে আমাদের অন্তরের মধ্যে সেই-যে সৃষ্টির আবেগ, সাহিত্য তাহারই বিকাশ। বিশ্বের নিশ্বাস আমাদের চিত্তবংশীর মধ্যে কী রাগিণী বাজাইতেছে সাহিত্য তাহাই স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সাহিত্য ব্যক্তিবিশেষের নহে, তাহা রচয়িতার নহে, তাহা দৈববাণী। বহিঃসৃষ্টি যেমন তাহার ভালোমন্দ তাহার অস্পূর্ণতা লইয়া চিরদিন ব্যক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে, এই বাণীও তেমনি দেশে দেশে, ভাষায় ভাষায়, আমাদের অন্তর হইতে বাহির হইবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করিতেছে।

অগ্রহায়ণ, ১৩১০